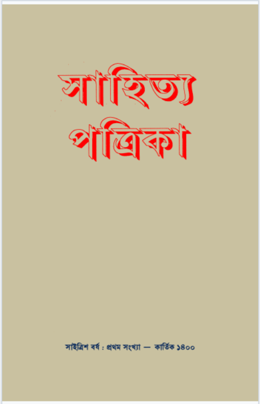

Vol. 37 | No. 1 | 1993

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

কবি হাফিজ ইব্রাহীম ও তাঁর কাব্যপ্রতিভা

Volume	37
Issue	1
Year	1993
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মুহাম্মদ ফজলুর রহমান
Published online	October 1, 1993
DOI	10.62328/sp.v37i1.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v37i1.6
Pages	107-121
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
বর্ষ ৩৭ : সংখ্যা ১

Check for updates

কবি হাফিজ ইব্রাহীম ও তাঁর কাব্যপ্রতিভা

মুহাম্মদ ফজলুর রহমান*

মুহাম্মদ হাফিজ ইব্রাহীম মিশরের একজন প্রধান কবি। উনবিংশ শতকের শেষ তিন দশক এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশক তিনি জীবিত ছিলেন। শৈশব থেকে জীবিকার জন্যে প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে যুঝার সঙ্গে সঙ্গে তার কাব্যচর্চা শুরু। তার সমগ্র রচনাবলি এখনো অসংগৃহীত হলেও *লায়ালী সাতীহ, আল-বুআসা, কাতীব ফীত-তারজামাতিল-আউওয়ালিয়্যা, আল-মূজায ফী ইলমিল-ইকতিসাদ, দীওয়ান* প্রভৃতির মধ্য দিয়ে আরবী কাব্যরীতিতে তিনি এক নতুন ধারা প্রবর্তন করেন। শিল্পবিচারে এবং সমকালীন মিশরের রাজনৈতিক-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাতে হাফিজের কাব্য ঋদ্ধ।

*সহকারী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মুহাম্মদ হাফিজ ইব্রাহীম মিশরের একজন প্রখ্যাত কবি। খ্রিষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশক মোটামুটিভাবে তাঁর কাব্যচর্চার কাল। মিশরের যেসব কবি-সাহিত্যিক তাঁদের রচনার মাধ্যমে পরাধীন দেশবাসীকে স্বাধীনতার চেতনায় উজ্জীবিত করতে কার্যকর অবদান রেখেছিলেন, হাফিজ ইব্রাহীম তাঁদের অন্যতম। আরবী ভাষায় নতুন কাব্যরীতি প্রবর্তনের ক্ষেত্রেও তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ছিল।[১]

সংক্ষিপ্ত জীবনী

মিশরের আসিয়ূত প্রদেশের অন্তর্গত দাইরূত শহরের সন্নিকটে নীল নদে নোঙরকৃত একটি ভাসমান নৌকায় ১৮৬৯ থেকে ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কোনো এক সময়ে হাফিজ ইব্রাহীমের জন্ম হয়।[২] তাঁর বাবার নাম ইব্রাহীম আফিন্দী ফাহ্মী ও মায়ের নাম আলিস্ত হানিম কারীমা। বাবা খাঁটি মিশরীয় আর মা তুর্কী বংশোদ্ভূত। হাফিজের জন্মকালে তাঁর বাবা ইব্রাহীম একজন প্রকৌশলী হিসেবে দাইরূত নগরীর বিভিন্ন সেতুর নির্মাণকাজ তদারকের জন্য নীল নদে ভাসমান ঐ নৌকায় সপরিবারে বাস করতেন [আবদুল হামীদ সিনদ আল-জুনদী ১৯৬৮ : ১৫]।

পিতামাতার একান্ত স্নেহে হাফিজের শৈশব কাটতে থাকে। কিন্তু তাঁর বয়স যখন মাত্র চার বছর তখন আকস্মিকভাবে তাঁর বাবার মৃত্যু হয়। অসহায় বিধবা মা শিশু হাফিজকে নিয়ে কায়রোতে তার ভাই (হাফিজের মামা) মুহাম্মদ আফিন্দী নিয়াযীর কাছে চলে যান। মামা হাফিজের লালনপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি তাকে একে একে কায়রোর আল-মাদ্রাসাতুল-খাইরিয়্যা (একটি মকতব), মাদ্রাসাতুল কিরবিয়্যা (একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়), মাদ্রাসাতুল-মুব্তাদিয়ান ও আল-মাদ্রাসাতুল-খিদীভিয়্যাতে ভর্তি করান। কিন্তু অস্থিরচিত্ত হাফিজ কোথাও প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করতে পারেননি।

১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে হাফিজের মামা তান্তায় বদলি হলে হাফিজকেও সেখানে নিয়ে যান; তবে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনাথ হাফিজের মনে পিতৃহীনতার অনুভূতি প্রকট হতে থাকে। জীবন সম্পর্কে তাঁর মনে ক্রমশঃ দানা বাঁধে সকরুণ এক হতাশা। এই হতাশা থেকেই হাফিজের মাঝে এক ধরনের কাব্যপ্রতিভা জন্ম নেয়। নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ ও হতাশাকে সম্বল করে তিনি বেশ কিছু কবিতা রচনা করেন। [আহমদ হাসান আল-যায়্যাত— : ৫০৪] ইতিমধ্যে কিছু সাহিত্যের বইপত্রও পড়তে আরম্ভ করেন। আবার মাঝে মাঝে তান্তার আল-জামিউল-আহমাদী (বা আল-মা'হাদুল-আইমাদী) নামক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে শিক্ষকদের কিছু কিছু বক্তৃতাও শুনতে থাকেন। এভাবে প্রাকৃতিক নিয়মে হাফিজের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হতে থাকে।

তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তির জোরে তিনি পূর্ববর্তী কবিদের বিশেষত আব্বাসীয় যুগের কবিদের অনেক কবিতা মুখস্থ করেন এবং বিভিন্ন সমাবেশ ও অনুষ্ঠানে ঐসব কবিতার প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি পেশ করে তান্‌তার সুধীমহলে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন [আবদুল হামীদ সিন্‌দ আল-জুনদী ১৯৬৮ : ১৭]। এত কিছুর মাঝেও তরুণ হাফিজ উপলব্ধি করছিলেন যে ক্রমশ তিনি মামার পরিবারে বোঝা হয়ে উঠছেন। তাই অর্থ উপার্জনের জন্য তিনি ফাঁকে ফাঁকে একটি কাজও অন্বেষণ করতে থাকেন।

নিয়মতান্ত্রিক ও স্থায়ী কোনো চাকুরির জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা-সনদ হাফিজের ছিল না। তাই কোনো মকতবে শিক্ষকতার কথা প্রথমে চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু এতে তাঁর প্রয়োজন মিটবে না ভেবে সে চিন্তা ত্যাগ করেন। অতঃপর স্বাধীন ওকালতি পেশার কথা ভাবলেন। কিন্তু এর জন্য একটি স্বতন্ত্র অফিস স্থাপনের সামর্থ্য তার ছিল না। তাই বাধ্য হয়ে তান্‌তার কয়েকজন আইনজীবীর সহকারীরূপে তাদের দফতরে কিছুদিন চাকুরি করেন। প্রথমে আইনজীবী মুহাম্মদ আশ-শীমী এবং তারপর একে একে মুহাম্মদ আবু শাদী, আব্দুল করীম ফাহীম ও ইব্রাহীম আল-হালবাবীর সঙ্গে থেকে ওকালতির কাজ করেন [আবদুল হামীদ সিনদ আল-জুলদী ১৯৬৮ : ১৮-১৯ ও আহমদ হাসান আল-যায়্যাত — : ৫০৪]। বারবার কর্মস্থল পরিবর্তন করেও ওকালতির পেশায় হাফিজ নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেননি। নির্দিষ্ট সময়সূচী অনুযায়ী অফিসে অবস্থান করে আইনের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণে মগ্ন থাকা তাঁর ধাতে সইল না।

১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে হাফিজ তান্‌তা ছেড়ে কায়রোর সামরিক কলেজে ভর্তি হবার জন্য সেখানে চলে যান। তখনকার দিনে সামরিক কলেজে ভর্তি হতে বিশেষ কোনো সনদ কিংবা নির্দিষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন হতো না। শুধুমাত্র *মেডিকেল ফিট্‌নেস* থাকলেই চলত। সুঠাম দেহ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হাফিজ অনায়াসে এই কলেজে ভর্তির সুযোগ পান। তিন বছরের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে উর্দি পরিহিত সৈনিক হাফিজ মাসিক বেতন-ভাতার নিশ্চয়তাসহ সামরিক কলেজ থেকে বের হন এবং ১৩ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯১ সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট পদে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে চাকরিতে যোগদান করেন। ১ অক্টোবর, ১৮৯৩ লেফ্‌টেন্যান্ট হিসেবে তাঁর পদোন্নতি হয়। অতঃপর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন পুলিশ বাহিনীতে বদলি হয়ে প্রথমে বানী সুওয়াইফ পুলিশ স্টেশনের পুলিশ সুপার (৭-৫-১৮৯৪ থেকে ২৩-৩-১৮৯৫ পর্যন্ত) এবং পরে আল-ইব্রাহীমিয়্যা পুলিশ স্টেশনের প্রধান পুলিশ অফিসার (২৪-৩-১৮৯৫ থেকে ১৫-১০-১৮৯৫ পর্যন্ত) হিসেবে কাজ করেন [হাফিজ ইব্রাহীম ১৯৩৭ : ৪]। তারপর আবার সেনাবাহিনীতে ফিরে আসেন এবং লর্ড কিচেনার (Lord Kitchener)-এর নেতৃত্বে ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে সুদানী ভূখণ্ডে মিশরীয় সামরিক অভিযানে প্রেরিত হন। এ উপলক্ষে দীর্ঘদিন তাঁকে পূর্ব সুদানে স্বীয়

ইচ্ছার বিরুদ্ধে অবস্থান করতে হয়। দেশে ফিরে যাবার জন্য অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। অবশেষে ১৮৯৯ সালে আরও কিছু সংখ্যক সেনা অফিসারের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। হাফিজসহ মোট ১৮জন বিদ্রোহীর সামরিক আদালতে বিচার হয়। বিচারের রায় অনুসারে হাফিজকে ৩ মে, ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে সেনাবাহিনী থেকে অবসর দেওয়া হয় এবং পরে তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১ নভেম্বর, ১৯০৩ থেকে তাঁর জন্য মাসে চার পাউন্ড করে পেনশনের ব্যবস্থা করা হয়।

সেনাবাহিনী থেকে অবসরগ্রহণের পর হাফিজের জীবনে আবার অনিশ্চয়তার অন্ধকার নেমে আসে। কফিখানা আর নৈশ আসরের আড্ডায় তাঁর সময় কাটতে থাকে। প্রয়োজনের তুলনায় পেনশনের পরিমাণ অতি নগণ্য হওয়ায় জীবিকার জন্য তিনি একটি কাজ খুঁজতে থাকেন। কিন্তু কোথাও কোনো কাজ জুটল না। এ সময়ে তাঁর সমসাময়িক অন্য এক প্রভাবশালী কবি আহমদ শাওকী তাঁর জন্য *আল-আহরাম* পত্রিকায় একটি চাকুরির সুপারিশ করেছিলেন, কিন্তু কিছুই ফল হয়নি। চরম হতাশার মধ্যে কিছুকাল কাটবার পর ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে কায়রোতে প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতা ও সমাজ সংস্কারক মুহাম্মদ আবদুহুর সান্নিধ্যে আসেন। আবদুহুর নিকট হাফিজ রাজনীতি ও সমাজসেবায় দীক্ষা গ্রহণ করেন।[৩] এ সময়ে মিশরের আরও কতিপয় রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে হাফিজের যোগাযোগ ঘটে। এঁদের মধ্যে সা'দ যগ্‌লূল পাশা, মুস্তফা কামিল ও কাসেম আমীন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য [*Encyclopaedia of Islam* : 59] রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রভাবে হাফিজের মধ্যে গভীর দেশাত্মবোধ জাগ্রত হয়, যার ফলে তিনি জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে কাব্যরচনায় অনুপ্রাণিত হন।

১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে হাফিজ তাঁর মায়ের ইচ্ছানুসারে হাওয়া নামের এক ধনীর দুলালীর সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন। কিন্তু এ বিয়ে অল্প কয়েক মাস পরেই ভেঙ্গে যায়। তিনি এরপর জীবনে আর বিয়ে করেননি। হাফিজের মা ১৯০৮ সালে মারা যান। কিছুদিন পর মামা মুহাম্মদ নিয়াযীরও মৃত্যু হয়। ফলে একমাত্র বিধবা ও নিঃসন্তানা মামী আয়শা হানিম ছাড়া আপন বলতে হাফিজের আর কেউ রইল না। মামী হাফিজের সঙ্গে থেকে তাঁর দেখাশুনার দায়িত্ব পালন করেন। এই মামীর প্রতি হাফিজের ছিল অগাধ শ্রদ্ধাবোধ। তিনি আমরণ তাঁর সঙ্গেই ছিলেন। হাফিজের মৃত্যুর মাত্র তিন বছর পূর্বে তিনি মারা যান [আবদুল হামীদ সিন্‌দ আল-জুনদী ১৯৬৮ : ৩৯]।

আর্থিক অনটনগ্রস্ত হাফিজ চাকুরির জন্য মিশরের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী আহমদ হাশ্‌মত পাশার শরণাপন্ন হন। শিক্ষামন্ত্রীর সুপারিশে ৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯১১ হাফিজকে

কায়রোর পাবলিক লাইব্রেরি দারুল-কুতুব (তৎকালীন খেদিভ গ্রন্থাগার)-এ মাসিক ত্রিশ পাউণ্ড বেতনে একটি চাকুরি দেওয়া হয়। ১৪ মার্চ, ১৯১১ তিনি উক্ত লাইব্রেরির সাহিত্য বিভাগের প্রধান হিসেবে অবেক্ষাধীনে নিয়োগ লাভ করেন এবং ১ এপ্রিল, ১৯১২ এক সরকারি আদেশে তাঁর এই চাকুরি স্থায়ী করা হয়। শেষজীবন পর্যন্ত তিনি দারুল-কুতুব-এর এই চাকুরিতে বহাল ছিলেন। অবসরগ্রহণকালে তাঁর মাসিক বেতন দাঁড়িয়েছিল আশি পাউণ্ড। ইতিমধ্যে ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর বয়স ৫৭ বছর পূর্ণ হলে তিনি ভাষা ও সাহিত্যে নিজের দীর্ঘদিনের সেবার কথা উল্লেখ করে মাসিক পঞ্চাশ পাউণ্ড পেনশন-ভাতা চেয়ে চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণের আবেদন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সে আবেদন মঞ্জুর হয়নি [হাফিজ ইব্রাহীম ১৯৩৭ : ৫]। অবশেষে ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩২ তিনি অবসরগ্রহণ করেন।

হাফিজ মোট ৩৫ বছর ৪ মাস ২৯ দিন সরকারি চাকুরি করেন। এর মধ্যে প্রতিরক্ষা ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ১৪ বছর ৬ মাস ৮ দিন এবং দারুল-কুতুব-এ ২০ বছর ১০ মাস ২১ দিন [হাফিজ ইব্রাহীম ১৯৩৭ : ৪]। চাকুরি থেকে অবসরগ্রহণের প্রায় সাড়ে পাঁচ মাস পর ২১ জুলাই, ১৯৩২ বৃহস্পতিবার ভোর পাঁচটায় কায়রোর উপকণ্ঠে আয-যাইতুন এলাকার একটি ক্ষুদ্র বাড়িতে কবি হাফিজ ইব্রাহীম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন [আবদুল হামীদ সিন্‌দ আল-জুলদী ১৯৬৮ : ৪৯]।

রচনাবলি

হাফিজ ইব্রাহীম মূলত কবি। তবে গদ্যেও তার সমান পারদর্শিতা ছিল। বিশেষ করে ফরাসী ভাষা থেকে আরবী গদ্যে কয়েকটি গ্রন্থের সার্থক অনুবাদ তাঁর এই পারদর্শিতার প্রমাণ বহন করে। হাফিজের কবিতার এক বিরাট অংশ কালের গহ্বরে হারিয়ে গিয়েছে। সংগৃহীত কবিতাসমূহ তাঁর *দীওয়ান* বা কাব্য-সংকলনে সন্নিবেশিত হয়েছে। নিম্নে হাফিজের রচনাবলির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া হল :

১। *লায়ালী সাতীহ*

নৈতিক শিক্ষাসম্বলিত বর্ণনামূলক গল্প। এতে মিশরীয় সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি কটাক্ষ করে লেখক তাঁর নিজস্ব সংস্কারমূলক চিন্তাধারা ব্যক্ত করেছেন। এটি ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে কায়রোতে প্রথম মুদ্রিত হয়।

২। *আল-বুআসা*

ফরাসী মহাকবি ভিক্টর হুগো রচিত *Les Miserables* থেকে চয়নকৃত কয়েকটি উপাখ্যানের আরবী অনুবাদ। বঞ্চিত মানবতার করুণ কাহিনী সম্বলিত এসব

উপাখ্যান হাফিজ ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে অনুবাদ করেন। *আল-বুআসা* কায়রোতে ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত ও তারপর অনেকবার পুনর্মুদ্রিত হয়। এই অনুবাদগ্রন্থ আরবী গদ্যে হাফিজের উৎকর্ষের একটি অনন্য প্রমাণ।

৩। *কাতীব ফীত-তারজামাতিল-আউওয়ালিয়্যা*
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় হাফিজ এই গ্রন্থ ফরাসী ভাষা থেকে আরবীতে অনুবাদ করেছেন। গ্রন্থটি ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম মুদ্রিত হয়।

৪। *আল-মূজায ফী ইল্‌মিল-ইকতিসাদ*
Paul-Leray-Beaulieu রচিত ফরাসী গ্রন্থের আরবী অনুবাদ। তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী আহমদ হাশমত পাশার নির্দেশে হাফিজ ও খলীল মুতরান যৌথভাবে এই অনুবাদ সম্পন্ন করেন। এটি ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে পাঁচ খণ্ডে কায়রোতে প্রকাশিত হয়।

৫। *দীওয়ান* (কাব্য-সংকলন)

অস্থির ও অনিয়মতান্ত্রিক জীবনে অভ্যস্ত কবি হাফিজ ইব্রাহীম প্রথম দিকে কখনো নিজের কবিতা সংরক্ষণের কথা ভাবেননি। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা যদি তাঁর কবিতা নিয়মিতভাবে প্রকাশ না করত, তাহলে এর খুব সামান্য পরিমাণই রক্ষা পেত। কবি তাঁর জীবদ্দশায় কিছু পরিমাণ কবিতা সংগ্রহ করে ছোট ছোট তিনটি খণ্ডে প্রকাশের ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। ইতিপূর্বে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ও বন্ধু-বান্ধবের নিকট সংরক্ষিত সীমিতসংখ্যক কবিতা এতে স্থান পায়। এর প্রথম খণ্ড মুহাম্মদ ইব্রাহীম হিলাল বেক-এর মূল্যবান টীকা-টিপ্পনীসহ ১৩১৯ (১৯০১) হিজরীতে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডদ্বয় যথাক্রমে ১৩২৫/১৯০৭ ও ১৩২৯/১৯১১ সালে প্রকাশিত হয়। এর পরবর্তী সময়ে রচিত হাফিজের কবিতা তাঁর জীবদ্দশায় সংগৃহীত হয়নি। হাফিজ ইব্রাহীম ও আহমদ শাওকীর মৃত্যুর (১৯৩২ খ্রি.) পর সিরীয় সাহিত্যিক সায়্যিদ আহমদ উবায়দ এই দুই মিশরীয় কবির কিছু কবিতা সংগ্রহ করে তাঁদের জীবন ও কাব্যপ্রতিভার মূল্যায়নসহ *দুই কবির স্মৃতি (যিক্‌রাশ-শাইরাইন)* নামক গ্রন্থে প্রকাশ করেন (দামেশক ১৩৫১ হি.)। অতঃপর ১৩৫৩ হিজরীতে কায়রোস্থ আল-হিলাল প্রকাশনী হাফিজের জীবদ্দশায় প্রকাশিত তিন খণ্ড এবং *দুই কবির স্মৃতি* গ্রন্থে সন্নিবেশিত হাফিজের সকল কবিতা একত্র করে কবির প্রথম *দীওয়ান* প্রকাশ করে [হাফিজ ইব্রাহীম ১৯৩৭ : ৩৩]। তবে এতে অন্তর্ভুক্ত কবিতা ছিল হাফিজের সমগ্র জীবনের বিশাল কাব্য-সম্ভারের তুলনায় খুবই সামান্য। তাই পূর্ণাঙ্গতর কাব্য-সংকলন প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা থেকেই যায়।

মিশরের শিক্ষামন্ত্রী আলী যাকী আল-ইরাবী পাশা দেশ ও জাতির স্বার্থে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক হাফিজের কবিতার বৃহত্তর সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

এই কাজে প্রধান সংন্বয়কারী হিসেবে তিনি প্রখ্যাত লেখক ড. আহমদ আমীনকে দায়িত্ব দেন। ইতিপূর্বে প্রকাশিত সংকলনের অতিরিক্ত আরও কবিতা সংগ্রহের জন্য ব্যাপক অনুসন্ধান চালানো হল। হাফিজের কবিতা প্রথম প্রকাশিত হবার তারিখ থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীর বিভিন্ন সংখ্যা তন্ন তন্ন করে কবিতা অনুসন্ধানের কাজ চলল। কারো কাছে হাফিজের কোনো কবিতা কিংবা তার সন্ধান থাকলে তা উদ্যোক্তাদের জানানোর জন্য পত্রিকার মাধ্যমে অনুরোধ করা হল [হাফিজ ইব্রাহীম ১৯৫৫ : ৩৩]। এভাবে কবিতার বিপুল সম্ভার সংগৃহীত হলে ড. আহমদ আমীন ও তাঁর দুই সহকর্মী আহমদ আয-যাইন ও ইব্রাহীম আল-আব্ইয়ারী প্রথমে তা বিষয়ভিত্তিকভাবে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেন। পরে প্রত্যেক অধ্যায়ের অধীন কবিতাসমূহ রচনা কিংবা প্রকাশের তারিখ হিসেবে সময়ানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত করা হয়। কবিতাসমূহের অন্তমিলবর্ণ (কাফিয়া) অনুসারে *দীওয়ানের* শেষের দিকে একটি বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র দেওয়া হয়। কবিতার প্রসঙ্গ, রচনা কিংবা প্রকাশের তারিখ, কঠিন শব্দের শাব্দিক ও প্রায়োগিক অর্থ, সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনা ইত্যাদির উল্লেখসহ প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজন করা হয়। বৃহত্তর ও অধিকতর পূর্ণাঙ্গ এই দীওয়ান ড. আহমদ আমীনের দীর্ঘ ভূমিকাসহ ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে দুই খণ্ডে কায়রোতে প্রথম মুদ্রিত হয়।

কাব্যপ্রতিভা

মামার সঙ্গে তান্তায় থাকাকালে তরুণ হাফিজের মধ্যে কবিতার প্রতি ঝোঁক সৃষ্টি হয়। তিনি বড় বড় কবিদের রচনা পাঠের সাথে সাথে নিজেও কিছু কিছু কবিতা লিখতে শুরু করেন। এ সময়ে রচিত তাঁর অপরিণত কবিতায় প্রধানত নিজের দুঃখ-দৈন্য আর হতাশার বহিঃপ্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। সেনাবাহিনীতে চাকুরিলাভের পরই হাফিজের পরিণত কাব্যের বিকাশ শুরু হয়। কঠোর নিয়মানুবর্তিতার কারণে সৈনিক জীবনের প্রতি বিরূপ হয়ে ক্রমশ তিনি কাব্যচর্চায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং সৈনিকের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি পূর্ণোদ্যমে কাব্যচর্চা অব্যাহত রাখেন। এভাবে একসময়ে সেনা শিবিরের গণ্ডি অতিক্রম করে গোটা মিশরে তাঁর যশ ছড়িয়ে পড়ে।

সেনাবাহিনী হতে অবসর গ্রহণ (১৯০০ খ্রি.) থেকে গ্রন্থাগারে চাকুরি লাভ (১৯১১ খ্রি.) পর্যন্ত কালটি জীবিকার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠিন ও অনিশ্চয়তাপূর্ণ হলেও কাব্যপ্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রে এটি ছিল হাফিজের জন্য সেরা সময়কাল। এ সময়ে তিনি ঔপনিবেশিক বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে এবং পশ্চাৎপদ ও পরাধীন মিশরবাসীকে স্বাধিকার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে অসংখ্য দেশপ্রেমমূলক কবিতা রচনা

করেন। তবে কবি-জীবনের সূচনাকালে তিনি মিশরের খেদিভ শাসক, তুর্কী সুলতান ও ঔপনিবেশিক ইংরেজদের প্রশংসায়ও কিছু কিছু কবিতা লিখেছেন। এসব কবিতার মধ্যে খেদিভ আব্বাসের স্তুতি, তুর্কী সুলতান আব্দুল হামীদের গৌরবগাথা, মহারানী ভিক্টোরিয়া সম্পর্কে শোকগাথা এবং রাজা সপ্তম এড্ওয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষে রচিত কবিতা উল্লেখযোগ্য [আহমদ হাসান আয-যায়্যাত — : ৫১৫]। পরবর্তীকালে মুহাম্মদ আব্দুহু ও মিশরের অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সংস্পর্শ তাঁর মধ্যে গভীর দেশাত্মবোধের জন্ম দেয়। দেশ ও জাতির দুরবস্থা দেখে তিনি ক্ষুব্ধ হতে থাকেন। এতে তাঁর মাঝে এক প্রতিবাদধর্মী জেহাদী কাব্য-প্রেরণার সৃষ্টি হয়। তিনি ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে বেশ কিছু বিপ্লবী কবিতা রচনা করেন এবং কবিতার মাধ্যমে স্বাধীনতার বাণী ও দেশপ্রেমের শিক্ষা চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেন। এইভাবে তাঁর লেখনী ক্রমশ মিশরীয় জাতির স্বাধীনতা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে ওঠে।

হাফিজ ইব্রাহীম ছিলেন সৃজনশীল প্রতিভার অধিকারী এক স্বভাবকবি। কবিতায় সাধারণ মানুষের হৃদয়ের অনুভূতি ব্যক্ত করে তিনি তাদের কাছের মানুষে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি যখন কোনো বিষয়ে কবিতা লিখতে মনস্থ করতেন তখন বিষয়টি সম্পর্কে জনগণের আবেগ অনুধাবন করার চেষ্টা করতেন, সভা-সমিতি ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত মতামত আত্মস্থ করতেন। তারপর বিষয়টিকে নিজের মনে করে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে নিজস্ব বর্ণনাভঙ্গিতে তা ছন্দোবদ্ধ করতেন। যার ফলে তাঁর কবিতার প্রতিপাদ্য বিষয় সহজেই সাধারণ মানুষের হৃদয়ে রেখাপাত করত; পাঠকের মনে হত, এ যেন তাদেরই মনের কথা [আহমদ হাসান আয-যায়্যাত — : ৫০৬]।

হাফিজ ছিলেন আধুনিক আরবী কাব্যরীতির অন্যতম স্থপতি। কবিতার গতানুগতিক কূপমণ্ডুকতা থেকে নিজেদের মুক্ত রেখে স্বভাবসুলভ নতুন কাব্য ধারা প্রবর্তনের জন্য মিশরের যে পাঁচজন স্বনামধন্য কবি আত্মনিয়োগ করেছিলেন, হাফিজ সেই পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম। অপর চার জন হলেন : মাহমুদ সামী আল-বারূদী (১৮৪০-১৯০৪), ইসমাঈল সাবারী (১৮৫৪-১৯২৩), আহমদ শাওকী (১৮৬৮-১৯৩২) ও খলীল মুতরান (১৮৭১-১৯৪৯)। তবে কবিতায় জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটানো ও সমাজে বিরাজমান সমস্যাবলী চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে হাফিজ ইব্রাহীম স্বতন্ত্র কৃতিত্বের দাবিদার [আহমদ হাসান আয-যায়্যাত — : ৫০৬]। তিনি সাধারণভাবে গোটা আরবজাতির এবং বিশেষভাবে মিশরীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও জাতীয় চেতনার প্রতিনিধিত্ব করে সমসাময়িক আরব কবিদের মধ্যে স্বীয় বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর রেখেছেন (*Encyclopaedia of Islam* 1979 :

59)। তাঁর কবিতায় মিশরের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয় বিস্তারিতভাবে বিধৃত হয়েছে এবং প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে কবির নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিও প্রতিভাত হয়েছে। বিশেষ করে রাজনৈতিক কবিতাগুলোতে তিনি পরিস্থিতির বাস্তবতা সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে সক্ষম হয়েছেন। তাই প্রকাশিত হবার সাথে সাথে হাফিজের কবিতা যেমনি আল-আয্হারের পণ্ডিতদের প্রশংসা অর্জন করে, তেমনি মিশরের গোটা সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে ও রাজনৈতিক মহলে সমাদৃত হয় [*Encyclopaedia of Islam* 1979 : 59]।

মূল্যায়ন

মিশরের প্রখ্যাত গল্পকার এবং সুপ্রসিদ্ধ *আল-আবারাত* ও *আন-নাযারাত* গ্রন্থদ্বয়ের গ্রন্থকার মুস্তফা লুত্ফী আল-মানফালূতী (১৮৭৬-১৯২৪) হাফিজের কাব্যপ্রতিভা মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলেন :

> হাফিজ একজন সুদক্ষ শিল্পী। জহুরী যেমন টুকরো টুকরো স্বর্ণ একত্র করে চমৎকার অলঙ্কার গড়েন, তিনিও তেমনি বাছাই করা শব্দরাজি শ্লোকমালায় গ্রথিত করে অনবদ্য কবিতা সৃষ্টি করেন। তাঁর কবিতায় একদিকে যেমন শব্দের সমারোহ আছে, তেমনি আছে বিন্যাস-শৈলীর মাধুর্য। তিনি একজন প্রথম সারির কবি। সামাজিক বিষয়ে তাঁর সৃষ্টি অনুপম। সারা আরব জাহানে তাঁর কবিতা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করছে। সাবলীল, বিশুদ্ধ ও বলিষ্ঠ রচনারীতির মাপকাঠিতে হাফিজের স্থান সমসাময়িক অন্য সবার ঊর্ধে। চমৎকার শব্দরাজি ব্যবহার ও বিরল প্রকাশভঙ্গি প্রয়োগের মাধ্যমে যে কজন কবি-সাহিত্যিক আরবী ভাষায় নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছেন, হাফিজ তাদের অন্যতম। তবে ভাষার ভাল-মন্দ তারতম্য নির্ণয়ে তাঁর মতো যথার্থ রুচির অধিকারী সমসাময়িক কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে আর কেউ আছেন বলে আমার জানা নেই [হাসান আদ-সানদুবী ১৯২২ : ৩৫০-৫১]।

হাফিজের সমসাময়িক আরেকজন প্রখ্যাত মিশরীয় কবি খলীল মুতরান (১৮৭১-১৯৪৯) বলেছেন :

> হাফিজ যে কোনো নির্জন জায়গায় বসে কবিতা লিখতে পারেন। এই নির্জনতার সন্ধানে তিনি প্রায়ই অপরাহ্নে বাগানে প্রবেশ করতেন। ভাস্কর যেমন সুন্দর সাইজের

এক একটি পাথর তৈরির পেছনে প্রচুর শ্রম ব্যয় করে, হাফিজ তেমনি কবিতার এক একটি চরণ রচনার জন্য নিরলস চেষ্টা করেন। উচ্ছ্বাসের তুলনায় যথার্থতার ওপর তিনি অধিক জোর দেন। নতুন কোনো কবিতা রচনার পূর্বে তার ছন্দ নিরূপণের জন্য প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবে একটি চরণ নির্দিষ্ট ছন্দের ছাঁচে ফেলে সুর করে বারবার আওড়াতেন এবং কানে ভাল লাগার পরই তিনি তার কবিতার ছন্দ চূড়ান্ত করতেন [হাসান আস-সানদুবী ১৯২২ : ৩৫২-৫১]।

প্রখ্যাত কথাশিল্পী ও *হাদীস ঈসা ইব্ন হিশাম* কাহিনীর রচয়িতা মুহাম্মদ ইব্ন ইব্রাহীম আল-মুওয়াইলিহী বলেন :

শ্রেষ্ঠ কবিতা তাকেই বলে, যার ভাষা বিশুদ্ধ, বক্তব্য সুন্দর এবং গঠন বলিষ্ঠ; যা অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতা থেকে মুক্ত; যা শুনতেও মধুর লাগে আবার অন্তরেও ছাপ ফেলতে সক্ষম হয় এবং সর্বোপরি যার প্রভাব হয় দৃঢ় ও স্থায়ী। আর হাফিজের কবিতা এই শ্রেণীর মধ্যেই পড়ে [হাসান আস-সানদুবী ১৯২২ : ৩৫২-৫১]।

কবিতার নমুনা

কাব্যে হাফিজ ইব্রাহীমের বিচরণক্ষেত্র নানাবিধ। ব্যক্তিগত সমস্যা ও হতাশার পাশাপাশি তাঁর কবিতায় জাতীয় আশা-আকাঙক্ষা এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক নানান বিষয়ের প্রতিফলন দেখা যায়। নমুনাস্বরূপ হাফিজের কবিতা থেকে কিছু কিছু অংশের কাব্যানুবাদ প্রসঙ্গ উল্লেখসহ নিম্নে পরিবেশিত হল।[৪]

তান্তায় থাকাকালে জীবনের দুঃখ-দৈন্য আর হতাশায় ম্রিয়মান কবি মৃত্যু কামনা করে রচনা করেন :

বিস্ময়ে ভাবি কেমনে যে বয়স বাড়িয়া উঠিল কবে!
কতনা যাতন সয়েছে জীবন দয়াহীন এই ভবে।
মৃত্যুকে আমি দেখিতেছি যেন সরে গেছে কিছুদূর,
বাসনা আমার, কতদিনে তার বাজিবে করুণ সুর!
এ জীবন হতে মৃত্যু আমার শ্রেয় জানি শতবার,
সুজন হয়েও লাঞ্ছিত আমি হেথায় বারংবার।[৫]

সৈনিক হিসাবে সুদানে দায়িত্ব পালনকালে নিজ দেশ মিশরের জনৈক বন্ধু মুহাম্মদ বাইরাম-এর নিকট প্রবাসজীবনের মানসিক অশান্তি লিখে জানান :

ভাগ্য আমার বন্দী হেথায়
বঞ্চনা আর বিষণ্ণতায়।
ঘর ছেড়েছি রুজির আশায়,
ঘুরছি যে এক গোলক ধাঁধায়।
মরণদন্তে দংশিত হায়
দুর্যোগের ঐ নখর থাবায়।[৬]

সুদানের প্রতিকূলতায় জর্জরিত কবির মন মিশরের জন্য অধীর হয়ে উঠেছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন :

পাদুকা আমার খুনে রঞ্জিত ধুলায় গড়ায় বালিশ,
সকলি নীরবে সহ্য করেছি করি নাই কভু নালিশ।
শরীরের ত্বক পোড়াইয়া মোর তপ্ত রুদ্র রবি
রাখিয়াছে মোরে ক্রীতদাস করে, নীরবে সয়েছি সবি।
নিঃস্ব করেছে অনটন মোরে, বীর্য নিয়াছে কাড়ি,
অভিযোগ তা-ও করিনি, এ গ্লানি সহিতে না আর পারি।
স্বদেশ আমার হে প্রিয় মিশর, হেরিব তোমায় কবে ?
শুঁকিব তোমার পবিত্র মাটি পরাণ শান্ত হবে।[৭]

সেনাবাহিনীর চাকুরি থেকে অবসরগ্রহণের পর জীবিকার প্রয়োজনে কবি একটি কাজের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু ব্যর্থতা আর হতাশা ছাড়া তাঁর ভাগ্যে কিছুই জোটেনি। তিনি লিখলেন :

মাঠে প্রান্তরে ছুটেছি, যখন মরুতে আগুন ঝরে,
তরুছায়ে সব হরিণেরা লয় বিশ্রাম অবসরে।
আঁধার বসন পরেছি, যখন নিশীথে ঘুমায় ধরা,
ভাগ্যের লাগি ছুটেছি কেবল, উদ্বেগে মন ভরা।
চিরদুঃখী আমি, সুখের সাক্ষাৎ ঘটেনি ললাটে যার,
নিঠুর নিয়তি করিয়াছে যারে আশাহত বারবার।[৮]

হতাশা যখন চরম পর্যায়ে, তিনি তখন জীবনের লাঞ্ছনা থেকে নিষ্কৃতির জন্য সম্মানের সাথে মৃত্যু কামনা করেছেন :

সালাম পৃথিবী বিদায়ী সালাম, নিভে যাক সব আলো,
গোরের আঁধারে হেরিয়াছি সুখ, বাসিবে সে মোরে ভাল।
প্রচণ্ড বেগে বহাওগো তুমি মরণের ঝড়ো হাওয়া,
নিভে যাক মোর জীবনের দীপ, শেষ হল সব পাওয়া।
যাতনা তোমায় দংশুক যত ডরিওনা হে হৃদয়,
আজিকার পরে কখনো তো আর যাতনার নেই ভয়।
অশ্রু আমার হয়েছে নিথর শোনহে চক্ষু, তাই
আর কোনো ভয় অশ্রু অথবা খুন ঝরিবার নাই।
অপমান পানে ধাওনি কখনো হে আমার দু'চরণ,
সম্মান ছাড়া একটিও ধাপ ওঠনি, রেখো স্মরণ।
মরণের পথে আগুয়ান হতে করোনাকো তাই ভয়,
সেরা জন সেই, মান থাকিতেই মরণ যে বরে লয়।[৯]

নারীর-শিক্ষা, সমাজে নারীর স্থান এবং নারীর প্রতি ন্যায়বিচার সম্পর্কে তিনি তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন :

জননী তো এক শিক্ষাঙ্গন, আগে গড় তার ভিত,
তাহলেই এক সুন্দর জাতি গড়িবে সুনিশ্চিত।
আমি তো বলিনা- নারীদেরে দাও বিচরিতে খোলা মাঠে,
পুরুষের মাঝে ঘুরিয়া বেড়াক মেলায় বাজারে হাটে।
নিজেদের কাজ ফেলিয়া তাহারা করিবে নরের কাজ,
যেখানেই খুশি ঢুকিয়া পড়িবে ছাড়িয়া শরম লাজ।
কক্ষনো নয়; আমি শুধু বলি- করিওনা বাড়াবাড়ি,
খাঁচায় বাঁধিয়া রেখোনা তাদেরে যেহেতু তাহারা নারী।
তোমাদের নারী সামগ্রী নহে, যত্ন করিয়া তারে
পুতুলের মত তুলিয়া রাখিবে যার যার বাড়ি ঘরে।
বাড়াবাড়ি আর শিথিলতা জেনো দুটোই অকল্যাণ,
সত্য ন্যায়ের মধ্যম পথে নারীদের সম্মান।[১০]

হাফিজ ইব্রাহীমের দীক্ষাগুরু মুহাম্মদ আব্‌দুহু ক্যান্‌সার বা কর্কটরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান (১৯০৫ খ্রি.)। ঐ বছর এক জ্যোতিষী বর্ষপঞ্জিতে তাঁর মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল [হাফিজ ইব্রাহীম ১৯৫৫ : ১০৯]। আব্‌দুহুর মৃত্যুর পরে লিখিত এক শোকগাথায় হাফিজ বিষয়টিকে এমনভাবে উপস্থাপন করেন যাতে গ্রহ-নক্ষত্র এবং রাশিচক্রের গতিবিধি ও প্রভাব সম্পর্কে তাঁর স্বচ্ছ ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ক্যান্‌সার রোগকে কর্কটরাশির প্রতীক কাঁকড়ার সাথে এবং মুহাম্মদ আব্‌দুহুকে সিংহরাশির প্রতীক সিংহের সাথে তুলনা করেছে এবং সিংহপুরুষ মুহাম্মদ আব্‌দুহুর ক্যান্‌সারে মৃত্যুবরণকে সিংহরাশির ওপর কর্কটরাশির অকস্মাৎ প্রভাব বিস্তারের অনিবার্য পরিণতি বলে উল্লেখ করেছেন :

রাতের আকাশে অশুভ দৃশ্য জ্যোতিষী দেখিল ভয়ে,
সাবধান করে দিল সে মোদেরে, বিপদ আসিছে ধেয়ে।
নভোমণ্ডলে হেরিল জ্যোতিষী, মহাবিপদের তরে
অশান্ত হয়ে উঠেছে রাশিরা সারাটি রজনী ভরে।
কর্কট করে শর নিক্ষেপ সিংহেরে দৈবাৎ,
কোনও কুক্ষণে দুর্বলও হানে সবলেরে শরাঘাত।
সিংহ লুটায় ধরণী-ধুলায়, বিদ্ধ ছলনা বাণে,
আকুল হইয়া ঝুঁকিল সকল গ্রহ-তারা তারি পানে।
ভূপতিত ঐ জ্যোতিষ্ক লাগি শোকপ্রকাশের তরে
তারকারা দেখ মিটি মিটি জ্বলে, তাকায় পরস্পরে।[১১]

ঐ শোকগাথায় তিনি আব্‌দুহুর মৃত্যুতে মিশরসহ সারা বিশ্বের শোকার্ত মানুষের ভারাক্রান্ত হৃদয়ের এক সকরুণ চিত্র তুলে ধরেছেন :

গর্বিত ঐ শবযান তাঁর সম্মুখ পানে চলে,
লাখো ভক্তের পরশে চুমুতে নাচিয়া নাচিয়া দোলে।
মহাজনতার অশ্রুর বান ভাসাইয়া নেয় তারে,
মাতম তাপিত নিঃশ্বাস-ঝড় সমুখে ধাক্কা মারে।
প্রাচ্য কাঁদিল, কাঁপিয়া উঠিল প্রচণ্ড বেগে ধরা,
নিখিল জগৎ কাঁদিয়া কাঁদিয়া অশ্রু করিল সারা।

ভারতবর্ষে নামিয়াছে শোক, চীনারা মাতম করে,
মিশরবাসীরা কাঁদিয়া অধীর, দুখী হল চিরতরে।
সিরিয়াতে ঐ আহাজারি শোন, ইরান বিলাপরত,
তিউনিসিয়ার আকাশে বাতাসে দীর্ঘনিশাস কত![১২]

হাফিজ ইব্রাহীমের কবিতায় তৎকালীন মিশরের অনেক রাজনৈতিক ও সামাজিক চিত্র নিখুঁতভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে এই কবিতা প্রথমে কবির মাতৃভূমি মিশরে এবং পরে গোটা আরব জাহানে ব্যাপক সাড়া জাগায়। সারা পৃথিবীতে আরবী সাহিত্যের পাঠকদের নিকট হাফিজ ইব্রাহীম আজ একটি অতি পরিচিত নাম। কাব্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের জন্য এই মহান কবি তাঁর স্বদেশ ও বহির্বিশ্বে সমাদৃত হয়ে আছেন।

টীকা

১. মিশরের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান কবি হাফিজের সঙ্গে বাংলার কবি কাজী নজরুল ইসলামের এক অদ্ভূদ মিল পরিলক্ষিত হয়।

২. হাফিজ ইব্রাহীমের জন্মতারিখ নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। কবি নিজেও তা বলতে পারেননি। ১৯১১ সালের ৪ ফেব্রুয়ারী কায়রোর পাবলিক লাইব্রেরির দারুল-কুতুব আল-মিস্‌রিয়্যা-য় চাকুরিতে নিয়োগকালে *মেডিক্যাল কমিশন* অনুমানের ভিত্তিতে তাঁর বয়স উনচল্লিশ বছর নথিভুক্ত করে। সে অনুযায়ী তাঁর জন্মতারিখ ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭২ বলে প্রচলিত আছে [আব্দুল হামীদ সিন্‌দ আল-জুনদী ১৯৬৮ : ১৬; হান্না আল-ফাখূরী — : ৯৬৬; আহমদ হাসান আয-যায়্যাত — : ৫০৪]।

৩. আব্দুহুর মৃত্যুতে হাফিজ একটি দীর্ঘ শোকগাথা রচনা করেছিলেন [হাফিজ ইব্রাহিম ১৯৫৫ : ১২৯-৩৪]।

৪. অনুবাদ প্রবন্ধকারকৃত। এতে আক্ষরিক অনুবাদের চেয়ে কবিতার মূল বক্তব্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

৫. মূল : আবদুল হামীদ সিন্‌দ আল-কুনদী ১৯৬৮ : ১৮।

৬. মূল : পূর্বোক্ত।

৭. মূল : হাফিজ ইব্রাহীম ১৯৫৫ : ১০৯।

৮. মূল : পূর্বোক্ত।

৯. মূল : পূর্বোক্ত ১০১-২।

১০. মূল : আবদুল হামীদ সিনদ আল-জুনদী ১৯৬৮ : ৪১।

১১. মূল পূর্বোক্ত : ১৩২।

১২. মূল পূর্বোক্ত : ১৩২।

গ্রন্থপঞ্জি

আবদুল হামীদ সিন্‌দ আল-জুনদী ১৯৬৮ — *হাফিজ ইব্রাহীম শাইরুন-নীল,* কায়রো।

আহমদ হাসান আয-যায়্যাত তা. বি — *তরীখুল-আদাবিল-আরাবী, বৈরুত :* দারুস-সাফাফা।

হাফিজ ইব্রাহীম

হান্না আল-ফাখ্‌রী তা. বি. — *তারীখুল-আদাবিল-আরাবী,* বুলিমিয়্যা প্রেস।

১৯৩৭ — *দীওয়ান,* প্রথম খন্ড। কায়রো : আল-হিলাল

১৯৫৫ — *দীওয়ান,* দ্বিতীয় খণ্ড। কায়রো : শিফা মন্ত্রণালয় (মিশর সরকার)

হাসান আস-সানদুবী ১৯২২ — *আস-সুআরা উস-সালাসা,* কায়রো।

Encyclopaedia of Islam 1979 — Hafiz Ibrahim, *Encyclopaedia of Islam,* new edition, vol. III. Leiden.